ধর্ম সম্পর্কে গান্ধীর ধারণা : একটি দার্শনিক আত্মসমীক্ষণ

অমিতা বাল্মীকি
ভাষান্তর : অনুরাধা দে

ভূমিকা

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮) তিনি মহাত্মা নামেই বেশি পরিচিত, বলেছিলেন যে, "একজন ধর্মহীন মানুষ, একটি নীতিহীন জীবনের সমার্থক এবং নীতিহীন জীবন হল দিকভ্রষ্ট জাহাজের মতো।" একজন মানুষের জীবনে ধর্মের ভূমিকার ওপর গান্ধী অসীম গুরুত্ব আরোপ করেন। কে. এল. শেষাগিরি রাও মনে করেন, গান্ধী বিশ্বাস করতেন যে ধর্মশিক্ষা ছাড়া যে কোনো শিক্ষাব্যবস্থাই অসম্পূর্ণ। ধর্ম তার বিবিধ রূপে শুধুমাত্র একটি বৈধ বৌদ্ধিক অনুসন্ধানের বিষয় নয়, বরং এটি মানবসভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। ... তাই গান্ধীর কাছে ধর্মশিক্ষা একটি বিশুদ্ধ তাত্ত্বিক বা কেতাবি বিষয়মাত্র ছিল না, এটির একটি বাস্তবসম্মত এবং অস্তিত্ববাদী প্রয়োজনের দিকও ছিল। এই কারণেই তিনি জীবন্ত ধর্মসমূহে আগ্রহী ছিলেন, ভূত ধর্মে নয়। জীবিত ধর্মগুলিই গান্ধীকে আকৃষ্ট করত এবং এটাই সঠিক পথ কারণ সমসাময়িক যুগে এটারই ভীষণ প্রয়োজন।

গান্ধী ভীষণ দুঃখিত ছিলেন এই কারণে যে তিনি ছোটবেলায় পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারেননি। সব ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্যে উপনীত হওয়ার নিখুঁত প্রয়াসে তিনি বলে ওঠেন, "আমি পৃথিবীর সমস্ত মহান ধর্মের মূল সত্যে বিশ্বাস করি। এবং আমি এটাও বিশ্বাস করি যে যদি আমরা সবাই ভিন্ন ভিন্ন মানুষদের দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের ধর্মশাস্ত্রগুলি পড়ে দেখি, তাহলে আমরা বুঝতে পারব যে মূলস্তরে সেগুলি সবই এক, এবং একে অপরের পক্ষে সহায়ক।"

Religion (ধর্ম) শব্দটি দুটি শব্দের সমন্বয়ে সৃষ্ট—'re' এবং 'ligare' অর্থাৎ একত্রে বেঁধে রাখা, যা সসীমকে অসীমের সঙ্গে বেঁধে রাখে, অর্থাৎ মানুষকে ঈশ্বরের সঙ্গে বেঁধে রাখে। God (ঈশ্বর) শব্দটি সাধারণভাবে নির্দেশ করে স্রষ্টা—দেবতাকে, যিনি সব ধরনের অধিবিদ্যাসম্মত গুণে গুণী—তিনি সর্বশক্তিমান, সর্বত্র বিরাজমান, সর্বজ্ঞ, সদাশয়, পরম, সনাতন, অসীম ও একমাত্র ব্যক্তিত্ব; এবং নৈতিক গুণেরও অধিকারী, যেমন—'ঈশ্বর কল্যাণময়', 'ভালোবাসাই ঈশ্বর' ইত্যাদি। ঈশ্বর ও ধর্ম সম্পর্কে গান্ধীর ধারণাটি প্রাচ্যবাদী। তাঁর কাছে সব ধর্মের ভিত্তি সমান, শুধু বাইরের কাঠামোটা আলাদা। নানা ধরনের পূজা-অর্চনা এবং আচারবিধি এই কাঠামোটিকে ধরে রাখে। এইসব লোকাচার পালনের নিয়মবৈচিত্র্য গান্ধীর কাছে গুরুত্বহীন। তিনি মনে করেন যে ভগবানের প্রতি সাধারণ বিশ্বাসই জগতের ধর্মগুলির সার্বজনীনতাকে ধরে রাখে। ধর্ম সম্পর্কে তাঁর ধারণায় এইসব গূঢ়তাত্ত্বিক অতীন্দ্রিয়বাদী আচারবিধিকে কখনোই প্রকৃত গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। গান্ধী কখনোই একক ধর্মকে মান্যতা

দেননি, বরং পৃথিবীর সব ধর্মের সার্বজনীন মহৎটিকে তুলে ধরার জন্য 'এক' ঈশ্বরের ধারণাকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।

বৃটিশ দার্শনিক আর. বি. ব্লেথওয়েটের (১৯০০-১৯৯০) মতে, সব ধর্মই নানারকম নৈতিক কার্যকলাপ, নীতিগত ধ্যানধারণা, মূল্যবোধ এবং আদর্শ আচরণবিধি আত্মস্থ করে থাকে। প্রতিটি ধর্মেই এই নৈতিক নির্দেশাবলী একই রকম। এবার প্রশ্ন হল—যদি বিশ্বের প্রধান ধর্মগুলি একই নৈতিক ধ্যানধারণার কথা বলে, তাহলে এক ধর্মের সঙ্গে আর এক ধর্মের পার্থক্য কোথায়? তাঁর উত্তরটি হল, তারা দুটি দিক থেকে আলাদা—

১. লোকাচারের ভিন্নতার সাপেক্ষে

২. লোককাহিনি বা মিথের পার্থক্যের সাপেক্ষে

ব্লেথওয়েটের মতে, লোকাচারের পার্থক্য অত গুরুত্বপূর্ণ নয়, কিন্তু ধর্মীয় গাথাগুলির মধ্যে যে পার্থক্য তা যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য কারণ সেই গল্পগুলি তাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। জীবনের কঠিন সময়ে এই কাহিনিগুলিই সমস্যার সমাধান করার কাজে মহৌষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এই সন্ধিক্ষণে গান্ধীর দৃষ্টিভঙ্গি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দেয়। যেহেতু এই গল্পগুলি লোকাচারের সঙ্গে সম্পর্কিত, তাই এইসব গল্পভেদে যে দীর্ঘ লোকাচারগুলি সম্পৃক্ত হয়ে আছে, লোকে তাই অক্ষরে অক্ষরে পালন করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, আল্লাহর প্রতি ইব্রাহিমের বিশ্বাসের চরম পরীক্ষার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে একটি গল্পের মাধ্যমে এবং তাতে দেখা যাচ্ছে যে আল্লাহ্ ইব্রাহিমকে আদেশ দিচ্ছেন তাঁর পুত্র ইশাককে কুরবানি দিতে; যখন তিনি নিজপুত্রের মুণ্ডচ্ছেদ করতে উদ্যত হলেন, আল্লাহ তাকে একটি লম্বকর্ণে পরিণত করলেন। ইসলামী গল্পের এই পর্যায়টি জৈন বা বৌদ্ধ ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে একেবারেই খাপ খায় না, কারণ এই দুই নিরীশ্বরবাদী ধর্ম স্রষ্টা-দেবতার জনপ্রিয় ধারণায় বিশ্বাসী নয় (কিন্তু তারা প্রত্যেক ব্যক্তিমানুষের মধ্যে ঐশ্বরিক উপস্থিতিতে বিশ্বাসী)। এই প্রসঙ্গে গান্ধীর বিশ্বাস হল, "ঐ একক ধর্মটি সমস্ত বক্তব্যের উর্দ্ধে। মনুষ্যসমাজ ত্রুটিপূর্ণ, তাই তাকে এমন ভাষায় উপস্থাপিত করে, যে ভাষাকে সে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, এবং তাদের কথাগুলিকে যারা ব্যাখ্যা করে তারাও একই রকম ত্রুটিপূর্ণ। সুতরাং, সহনশীল থাকা একান্ত প্রয়োজন। তার মানে এই নয় যে, কাউকে তার নিজের বিশ্বাসের প্রতি উদাসীন থাকতে হবে, বরং সে বিশ্বাসকে আরও বুদ্ধিদীপ্ত ও বিশুদ্ধ ভালোবাসা প্রদান করতে হবে।"

যে সহনশীলতার কথা এখানে বলা হল, তাতে অন্যায় অবিচারকে সহ্য করে তার সঙ্গে আপোষ করে বাঁচার কথা বলা হয়নি। সহনশীলতার ধারণাটি মূলত অন্তর্থক। এতে বোঝানো হয়েছে ধৈর্যধারণের কথা যা পারস্পরিক বোঝাপড়ার রঙে রঞ্জিত এবং অন্যান্য ধর্মের দার্শনিক ও নৈতিক ভাবনায় অন্তর্মুখী অংশগ্রহণের দ্বারা বিধৃত। সাম্প্রতিককালে যে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে তা ঈশ্বর সম্পর্কে নয়, এইসব বিতর্ক এবং কট্টরপন্থী সন্দর্ভগুলি সবই ধর্ম সম্পর্কে শোনা গেছে। অর্থাৎ আলোচনার বিষয়বস্তু 'ঈশ্বর' থেকে 'ধর্মে' স্থানান্তরিত হয়ে গেছে কারণ 'ঈশ্বর' একটি বিরোধাতীত এবং দ্বন্দ্বহীন ধারণা হিসেবে রয়ে গেছে। যেসব ধর্মে ঈশ্বরের এই জনপ্রিয় ধারণাটি রয়েছে—বা যে সব ধর্মে তা নেই, যেমন জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম—তাঁরা কেউই এই দিব্য ধারণাটিকে অস্বীকার করেননি। এই দেবত্বই ধর্মকে ধারণ করে এবং তাকে সার্বজনীন চরিত্র

প্রদান করে। গান্ধীর কাছে ধর্ম ছিল একটি মানবিক প্রতিষ্ঠান, যা মানুষের সৃষ্টিশীলতার দ্বারা গড়ে উঠেছে, বাস্তব সমস্যা এবং আধ্যাত্মিক বিষয়, এ দুইয়ের সমাধানের জন্য।

গান্ধী, ধর্ম এবং মানবজীবনের নানা দিক

যদিও রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সামাজিক সমস্যার বিষয়ে গান্ধীর নিজস্ব মতামত ছিল, কিন্তু এইসব নানাপ্রকার সমস্যার অতলে ধর্ম বিষয়ে তাঁর উৎসাহটিও অমলিন ছিল, এবং এর কারণ হল তাঁর সত্যানুসন্ধান। তাঁর আত্মজীবনী—"সত্যের সঙ্গে আমার পরীক্ষানিরীক্ষার কাহিনিগুলি" (The Stories of My Experiments with Truth)—এটিও সত্যের সন্ধানে গান্ধীর সংগ্রামের ওপরেই আলোকপাত করে। এই সত্য তাঁর কাছে ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুই নয়। এই অভিনব বোঝাপড়াই শেষে অহিংসাকে তাঁর চূড়ান্ত স্বীকৃতি দেওয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এবং তারই প্রতিফলন দেখি তাঁর বিখ্যাত আদর্শবাণীতে—আমি পাপীর বিরুদ্ধে নই, পাপের বিরুদ্ধে। সক্রেটিস বলেছিলেন, 'গুণই জ্ঞান'। গান্ধীর ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে, 'গুণই অহিংসা'। তিনি বিতর্ক ও যুক্তির মাধ্যমে ঐ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। যা কিছু তাঁর কাছে যুক্তির দ্বারা সিদ্ধ হত না, তা তাঁর ক্ষেত্রের বাইরে থাকত। তিনি মাউন্টের উপদেশাবলীর (Sermon of the Mount) দ্বারা এবং জৈনধর্মের অহিংসার ধারণা দ্বারা খুবই প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু যেভাবে তিনি তাঁর যুক্তি দিয়ে হিন্দুধর্মকে স্বীকার করেছিলেন, অন্য কোনো কিছুরই আবেদন তার চেয়ে বেশি হয়ে ওঠেনি। আমরা যদি গান্ধীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক আদর্শগুলির বিষয়ে কথা বলি—একদম প্রথমে তাঁর সত্যাগ্রহের আদর্শ (অহিংস প্রতিরোধের ধারণা, সত্যকে আঁকড়ে ধরে শান্তিপূর্ণভাবে লড়াই করা, সত্যের ওপর জোর আরোপ করে সৎ জীবনযাপন করা), তাঁর আইন অমান্য ও অসহযোগ আন্দোলন, তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রের ধারণা—'রামরাজ্য' (এমন একটি রাষ্ট্র যা রাজা রামের আইন দ্বারা শাসিত হবে; সেই রাজা, যিনি নানা কর্তব্য এবং তাদের মধ্যে প্রাধান্য দেওয়ার বিষয়টির ওপর জোর দিয়েছিলেন—যাঁকে আমরা ভারতের মহান মহাকাব্য রামায়ণে দেখতে পাই একজন রাজা হিসেবে, একজন সন্তান, স্বামী, পিতা ইত্যাদি বিভিন্ন চরিত্রে) এবং স্বরাজ—এই সবকিছুর মূলে রয়েছে তাঁর ধর্মীয় দর্শন মূলত হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ ও খৃষ্টধর্ম। ভগবদ্‌গীতায় নিষ্কাম কর্মের আদর্শ (কর্তব্যের জন্যেই কর্তব্য পালন, কর্মে আত্মবলিদান), জৈনধর্মে অহিংসার গুরুত্ব, বৌদ্ধধর্মের মূল আদর্শে অহিংসা ও সহমর্মিতার স্থান এবং খৃষ্টধর্মে যীশুখৃষ্টের ক্ষমা ও বিস্মৃতির ধ্যানধারণা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। তাঁর সমস্ত রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার এই ধ্যানধারণাগুলির দ্বারা অলংকৃত হয়েছিল। জুডো-খৃষ্টীয় এবং ইসলামিক দর্শনে প্রাপ্ত অছিব্যবস্থার ধারণাকে গান্ধী তাঁর 'প্রকৃতি' দর্শন এবং অর্থনৈতিক নীতিনির্ধারণের কাজে প্রয়োগ করেছিলেন।

সত্যাগ্রহ এবং অহিংসার সঙ্গে হিন্দুধর্মের সম্পর্ক বিষয়ে গান্ধীর দৃষ্টিভঙ্গি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন এম.ভি. নাদকার্নি। "যদিও হিন্দুধর্ম সম্পর্কে গান্ধীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি মূলত ব্যক্তির আচার আচরণ এবং নৈতিকতার ওপরেই গুরুত্ব আরোপ করে, কিন্তু এটি ঈশ্বরবিশ্বাসকেও পুরোপুরি এড়িয়ে চলতে পারে না। তাঁর কাছে সত্যই হল ভগবান, এবং সত্যানুসন্ধানই ধর্ম। তাঁর কাছে হিন্দুধর্ম হল সত্যকে খোঁজার একটি প্রক্রিয়া। সাধারণভাবে তাঁর ধর্মে লোকাচারের কোনো স্থান নেই, যদিও তিনি অন্যের পূজাঅর্চনাজনিত লোকাচার পালনে কোনো আপত্তি

করেননি, যদি অবশ্য সেটা অহিংস হয়। অহিংসাই ছিল তাঁর কাছে সত্যকে খোঁজার মূল মাধ্যম। এর জন্যে কোনো লোকাচার পালনের প্রয়োজন নেই। মনের শুদ্ধিকরণের জন্য এবং সত্যানুসন্ধানের সংকল্পকে মজবুত করার জন্য কোনো শ্রেণিভেদ না রেখে শুধুমাত্র ভজনগান অথবা দেবতার উদ্দেশে ভক্তিসহকারে প্রার্থনাতেই তিনি উৎসাহ দিয়েছেন।

স্বদেশী অর্থাৎ আত্মনির্ভরতা বা অর্থনৈতিক স্বাধীনতায় গান্ধীর যে বিশ্বাস, সেটিও ছিল তাঁর ধর্মবিশ্বাসের মতো। এর কারণ হল, তিনি মনে করতেন যে আসলে এর অর্থ হল আত্মার পরম বন্ধনমুক্তি এবং জাগতিক বন্ধন থেকে স্বাধীনতা।

সত্যাগ্রহও গান্ধীর দ্বারা স্বীকৃত এমন এক পন্থা যার একটি ধর্মীয় মেরুদণ্ড রয়েছে। সত্যাগ্রহ হল 'বিশ্বব্যাপী সংহতি স্থাপনের মাধ্যমে সার্বজনীন উন্নয়ন' অথবা, 'সামাজিক কল্যাণের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিশ্বসংহতি'। তাঁর মতে, "ঈশ্বর হলেন সত্য, প্রেম, ন্যায় ও নৈতিকতা"। সুতরাং অন্যভাবে বলতে গেলে, নৈতিক ধ্যানধারণা এবং জীবনের নৈতিক মার্গের সঙ্গে সত্যাগ্রহকে যুক্ত রাখা প্রয়োজন।

যীশুখৃষ্টের মতো গান্ধীও কোনো নতুন ধর্ম সৃষ্টি করতে চাননি। যেমন, তিনি বলেছিলেন যে, "আমি কোনো নতুন ধ্যানধারণা সৃষ্টি করেছি বলে দাবি করিনা। আমি শুধু আমার মতো করে চেষ্টা করেছি আমাদের রোজকার জীবনের এবং সমস্যাগুলির মধ্যেকার সনাতন সত্যগুলিকে বাস্তবে প্রয়োগ করার। যাই হোক, আমার দর্শন, যদি আদৌ একে এই নামে ডাকার ভান করা যায়, তা আমি যা বলেছি তার মধ্যেই আধারিত রয়েছে। তোমরা একে গান্ধীবাদ (Gandhism) বলতে পারোনা কারণ এর মধ্যে কোনো 'ism' নেই। এবং এর জন্য কোনো বিস্তারিত সন্দর্ভ রচনা করা বা তার প্রচারেরও প্রয়োজন নেই।"

গান্ধী মনে করতেন যে, আগে অনুশীলন কর, তারপর প্রত্যক্ষ কর। কিন্তু উপরোক্ত বক্তব্য থেকে এটা মনে হয় যে তিনি শুধুমাত্র অনুশীলনে বিশ্বাস করতেন এবং অনুশীলনই ছিল তাঁর কাছে ইন্দ্রিয়ানুভূতি। এভাবেই বলা যায় যে, গান্ধী ছিলেন কট্টর অনুশীলনবাদী। মনীষা বড়ুয়া এর যথার্থ ব্যাখ্যা দিয়েছেন, "তাই মহাত্মা গান্ধীর সম্পর্কে এটা বলা যায় না যে তিনি দর্শনের কোনো নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করেছেন বা জ্ঞানের নিরিখে কোনো নতুন ধর্মের প্রবর্তন করেছেন। সারা বিশ্বের মহান ঐতিহ্যবাদী দার্শনিক ও ধর্মগুরুদের থেকে তিনি শুধুমাত্র চিরন্তন সত্যের সারাৎসার আত্মস্থ করেছিলেন। কিন্তু এক্ষেত্রে গান্ধীর অবদান হল এই যে, এইসব শিক্ষার মধ্যে যেগুলি তাঁর মনে রেখাপাত করেছিল, সেগুলিকে তিনি নিজের মতো করে আত্মস্থ করেছিলেন এবং শুধুমাত্র ব্যক্তিগত জীবনে নয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানকল্পেও তা প্রয়োগ করেছিলেন। এদিক থেকে গান্ধীকে একজন ফলিত দার্শনিক বলা যেতে পারে"।

গান্ধীকে 'প্রয়োগবাদী দার্শনিক' বলাটা ভীষণভাবেই প্রাসঙ্গিক। কারণ, গান্ধীকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে তাঁর জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য কি? —আর্থিক সমৃদ্ধি লাভ, রাজনৈতিক সংস্কার, না ধর্মীয় রেনেশাঁ। তাঁর জবাব ছিল—ধর্মীয় পুনর্জাগরণ—কারণ, তিনি এমন একটি ধর্মানুগ জীবন কাটাতে চেয়েছিলেন, যা সম্পূর্ণভাবে মানবতার সঙ্গে সংযুক্ত; রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় থেকেও এটা অর্জন করা সম্ভব। Unto Tahtinen তাই বলেছেন, "রাজনৈতিক কাজে অংশগ্রহণ করাটা তাঁর কাছে একটি ধর্মানুগ জীবনে পৌঁছোনোর মাধ্যম

ছিল। ধর্মীয় নীতি প্রয়োগের জায়গা হল রাজনীতি। আমরা যদি গান্ধীকে একজন রাজনীতিবিদ হিসেবে বোঝার চেষ্টা করি, তাহলে প্রথমে তাঁকে একজন ধার্মিক ব্যক্তি হিসেবে বুঝতে হবে।"

আবারও আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছোই যে গান্ধী ছিলেন একজন 'প্রয়োগবাদী দার্শনিক'। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার কারণ এটাও যে তিনি 'কর্মের আদর্শে' গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন এবং নিষ্কাম কর্মের ধারণায় বিশ্বাস করতেন, অর্থাৎ কর্মফলের আশা না করেই কর্ম সম্পাদন করা অর্থাৎ কর্তব্যের জন্যেই কর্তব্য করা। এই কারণেই তিনি অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতেন কারণ সেটা তিনি কর্তব্য বলে মনে করতেন। তাঁর কাছে ধর্ম মানুষের রোজকার জীবনযাত্রার থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো পথ নয়। যদিও ধর্ম চরিত্রের দিক থেকে আধ্যাত্মিক, তবু সেটি সমগ্র মানবতার সঙ্গে এবং মনুষ্যজীবনের প্রতিটি পরতে জড়িয়ে আছে। সুতরাং এটা বলা যেতেই পারে যে তিনি রাজনৈতিক জগৎটিকেও আধ্যাত্মিকতায় রঞ্জিত করতে চেয়েছিলেন।

গান্ধী যেমন রাজনীতিকে আধ্যাত্মিকতায় যুক্ত করতে চেয়েছিলেন, তেমনই শুধু রাজনীতি নয়, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকেই তিনি এভাবে যুক্ত করতে চেয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন যে যদিও ঐতিহাসিক দিক থেকে দেখতে গেলে পৃথিবীতে অনেকগুলি ধর্মের অস্তিত্ব রয়েছে, কিন্তু তাদের প্রত্যেকটিকে 'ধর্ম' নামে অভিহিত করার কারণ হল এই যে, একটি অন্তঃসলিলা সাধারণ ধর্ম তাদের সবার মধ্যে বহমান। ঐতিহাসিক সব ধর্মের এই যে সাধারণ ভিত্তিকে তিনি ইঙ্গিত করেছিলেন, তা ছিল একটি 'সার্বজনীন ধর্ম'। কোনো বিশেষ ধর্ম, সব ধর্মের এই সার্বজনীন ধারণার সঙ্গে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেনি বা তার সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়নি।

প্রাচ্যধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যেক ব্যক্তিমানুষের জীবনে একটি আধ্যাত্মিক লক্ষ্য থাকতে হবে এবং সেটি হল আত্মোপলব্ধি, যা মোক্ষলাভের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। গান্ধীর মতে, এক্ষেত্রে দুটি উৎস কাজ করে থাকে, তার মধ্যে একটি হল—অদৃশ্য শক্তি এবং অপরটি হল—মানুষের প্রচেষ্টা, যাকে তিনি বলেছেন, নিষ্কামকর্ম। ভগবদ্‌গীতার দর্শন গান্ধীর জীবনকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছিল, যে কারণে তিনি বলেন, "গীতার বাণীতে আমি যে সান্ত্বনা পাই, সারমন্ অফ মাউন্টেও আমি তা পাইনি। হতাশা যখন আমার মুখের দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে থাকে এবং একা আমি কোনো আশার আলো দেখতে পাইনা, আমি ভগবদ্‌গীতায় ফিরে যাই। আমি তার শ্লোকগুলি যত্রতত্র খুঁজে পাই এবং সঙ্গে সঙ্গে গভীর দুঃখের মধ্যেও আমি হাসতে থাকি। আমার জীবন অসংখ্য বহিরাগত দুঃখের তাড়নায় জর্জরিত কিন্তু যদি তারা আমার ওপর কোনো দৃশ্যমান ও অপূরণীয় ক্ষত রেখে যেতে সক্ষম না হয়ে থাকে, তাহলে তার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব আমি ভগবদ্‌গীতা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষাকেই দেব।

ভগবদ্‌গীতা হল শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর প্রিয় বন্ধু ও শিষ্যের মধ্যেকার কথোপকথন; কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যখন অর্জুন হতাশ কারণ তিনি তাঁর আপনজনদের সঙ্গে আর লড়াই চালিয়ে যেতে পারছেন না এবং এত রক্তপাত সহ্যও করতে পারছেন না, ঠিক সেই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে তাঁর যোদ্ধার কর্তব্যের কথা মনে করিয়ে দেন; এর সম্যক বর্ণনাই ভগবদ্‌গীতার দর্শনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। গীতায় বিশ্বাস এই যে, মানবজীবনের তিনটি পথ একইরকম গুরুত্বপূর্ণ—এবং এই তিনটি পথ হল, কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ। শুধুমাত্র একটি পথ অবলম্বন করে সমস্যার সমাধান করা যাবে না। এই তিনটি পথের সম্পূর্ণ সংশ্লেষ ও

সমন্বয়সাধন করা প্রয়োজন। একইভাবে, গান্ধী মানবজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে ভেদাভেদ করেননি—তা ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সামাজিক, যাই হোক না কেন। সবগুলিকেই আধ্যাত্মিকতায় রূপান্তরিত করতে হবে; তারা পরস্পরবিচ্ছিন্ন পন্থা হিসেবে রয়ে যেতে পারেনা। মানবজীবনের সব কটি প্রধান বিচরণক্ষেত্রেই আধ্যাত্মিকতার ধারাবাহিকতা বজায় রাখা প্রয়োজন—গান্ধী এই মতের প্রবল সমর্থক ছিলেন।

নিষ্কাম কর্ম তাই নৈতিকতাকে নৈতিকতাতেই শেষ হতে দেয়। গান্ধী বিশ্বাস করতেন যে যদি কেউ কর্মফলের দিকে মনোযোগ দেয়, তাহলে সেই কর্মফল সর্বদা কর্মপদ্ধতিকে যথার্থ প্রতিপন্ন করতে চাইবে। এটা শুধুমাত্র বিপজ্জনকই নয়, ধ্বংসাত্মকও বটে, গান্ধী এরকমটাই মনে করতেন। কারণ যদি কর্মফলকেই সবিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় তাহলে কর্মপদ্ধতি যে কোনো অনৈতিক চেহারা ধারণ করতে পারে—যেমন, বলপ্রয়োগ, নৃশংসতা বা সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ। এটা হতে দেওয়া যায় না। তাই গীতায় বর্ণিত নিষ্কাম কর্মের আদর্শ—কর্মে মোক্ষলাভই হল বিশ্বসংহতি স্থাপনের লক্ষ্যে শ্রেষ্ঠ যাত্রাপথ, অর্থাৎ 'লোক্ষ্যমগ্রহ'। এটি তাঁর সর্বোদয়ের ধারণা—যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

গান্ধী কি শুধুমাত্র হিন্দুধর্মের একজন নিবেদিতপ্রাণ অনুগামী ছিলেন এবং তাই তাঁকে একজন সত্যিকারের হিন্দু বলা যায়? মিস বড়ুয়া খুব সুন্দরভাবে এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাঁর জীবন গড়ে ওঠার প্রথম দিকে তিনি সব ধরনের প্রভাবের মধ্যে দিয়ে গিয়েছেন। তাঁর ছেলেবেলার দিনগুলিতে তিনি বৈষ্ণব এবং জৈন ভাবধারায় প্রভাবিত হয়েছিলেন। খৃষ্টান মিশনারীদের কর্মপ্রক্রিয়ার সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ঘটেছিল। ইংল্যান্ড ও সাউথ আফ্রিকায় থাকার সময় তিনি খৃষ্টীয় ধর্মমতের দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু এই ধরনের প্রভাব তাঁকে তাঁর নিজের ধর্মীয় ঐতিহ্যকে বোঝার জন্য উৎসাহী হতে সাহায্য করেছিল। গান্ধী বুঝেছিলেন যে মূলভাবের দিক থেকে সব ধর্মই এক এবং তাই সম্পূর্ণ ভিন্ন গতের একটি ধর্ম অনুসরণ করার থেকে নিজের ধর্মকে মনোযোগ সহকারে পালন করাই ভালো। গান্ধী একজন গোঁড়া হিন্দু ছিলেন কিন্তু তাঁর মন ছিল উন্মুক্ত। অন্যান্য ধর্মীয় মতবাদ আসার পথ খোলা রেখেই তিনি নিজের বিশ্বাসকে আরো শক্তিশালী করে তুলেছিলেন, এবং এটা তাঁকে আরো ভালো হিন্দু হয়ে উঠতে সাহায্য করেছিল। এটি অন্যধর্মের প্রতি তাঁর মনোভাবের নিরিখে যাচাই করা যায়। পৃথিবীর প্রতিষ্ঠিত ধর্মগুলির ভাবতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর সম্যক ধারণা ছিল এবং তিনি প্রয়োজনে কোনো ধর্মের সমালোচনা করতে দ্বিধাবোধ করতেন না—তা সে হিন্দুধর্ম, খৃষ্টধর্ম, ইসলাম বা ইহুদীধর্ম যাই হোক না কেন। হিন্দুধর্মাচরণের অনুষঙ্গে কতকগুলি রীতিনীতি সংযুক্ত হয়েছিল তার মধ্যে একটি ছিল "অস্পৃশ্যতা", যাকে তিনি মানবজাতির অভিশাপ বলে মনে করতেন। সত্যি বলতে তিনি দলিতদের 'হরিজন' পর্যন্ত বলেছেন যার অর্থ—"মানুষরূপী ঈশ্বর"। তিনি মন্দিরে প্রবেশ করতে চাইতেন না কারণ হরিজনদের সেখানে প্রবেশাধিকার ছিল না। তিনি নিজের পৈতেটি খুলে ফেলেছিলেন, কারণ হরিজনদের যদি পৈতে পরার অধিকার না থাকে তাহলে এ পৈতের কোনো অর্থই হয় না। ইসলাম ধর্মের জিহাদের ধারণা—তাঁর মতে কোনো বাস্তবসম্মত ধর্মযুদ্ধ নয়, এটি বরং একটি অন্তর্থক ধারণা, সত্যাগ্রহে তাঁর গভীর বিশ্বাসের মতো, যাকে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন একটি অহিংস সংগ্রাম হিসেবে এবং নিজের অন্তরে ভালো এবং মন্দ এই দুই প্রকার শক্তির মধ্যেকার যুদ্ধ হিসেবে। একের অন্তরে এই ধর্মীয় সংগ্রাম প্রকৃতপক্ষে গীতায় বর্ণিত ধর্মযুদ্ধের ধারণাকে মনে করায়, যা

মূলত ধর্ম আর অধর্মের লড়াই যেখানে ধর্মের জয় অবশ্যম্ভাবী। সমবেত প্রার্থনা গান্ধীর ধর্মসাধনার অঙ্গ ছিল। একই সঙ্গে এটাও বলা যায় যে, গান্ধী কখনোই কোনো একটি বিশেষ ধর্মকে একটি সুবিধাজনক জায়গায় তুলে ধরেননি। যদিও তিনি সবসময়ই নিজেকে একজন হিন্দু বলে দাবি করতেন, আমরা যেমন আগে দেখেছি, জাতপাত বা অস্পৃশ্যতার মতো সামাজিক ব্যবস্থা—যদি হিন্দুধর্মে অঙ্গীভূত হয়ে থাকে—তাহলে তিনি খোলাখুলিভাবে তাকে অস্বীকার করেছেন। যদিও তিনি সর্বধর্মের মধ্যে সার্বজনীনতার সন্ধান করেছিলেন এটা বলে যে সব ধর্মের একটি সাধারণ ক্ষেত্র রয়েছে এবং তা হল ঈশ্বর, যার ভিত্তির ওপর সব ধর্মগুলি দাঁড়িয়ে আছে; তিনি কখনোই এই মত পোষণ করেননি যে কোনো একটি বিশেষ ধর্মকে 'সার্বজনীন ধর্মের' তকমা দেওয়া যেতে পারে। তিনি এমনকি একথাও বলেছিলেন যে, ধর্মগুলির যে দৈবিক উত্তমের কথা ঋষিরা বা ধর্মগুরুরা উল্লেখ করেছেন বেদ, কোরান, বাইবেল বা দশ দৈবাদেশ (Ten Commandments)-এর মতো ধর্মশাস্ত্রে, সেটিও কিন্তু সম্পূর্ণ অভ্রান্ত নয়। অবশ্যই এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে, যে মাধ্যমে আমরা তাদের প্রকাশিত হতে দেখি তা সন্দেহাতীত, কিন্তু যাদের মাধ্যমে (অর্থাৎ মানুষেরা) আমরা এই ধর্মশাস্ত্রগুলি পেয়ে থাকি, তাদের সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থেকেই যায়, কারণ মানুষ হল সসীম আর তাই সে আমাদের সম্পূর্ণ সত্যের একটি ঝলকমাত্র দিতে পারে। সুতরাং এই ক্ষেত্রে বলা যায় যে কোনো একটি ধর্ম সার্বজনীন ধর্মের রূপ দিতে পারে না। বিতর্ক এবং যুক্তির দ্বারা সব ধর্মের নির্যাস আহরণ করে তাই গ্রহণ করা যেতে পারে।

আবার দেখতে পাই যে গান্ধীর অর্থনীতিরও একটি ধর্মীয় ভিত্তি রয়েছে। তিনি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পিরামিডাকৃতি কাঠামোতে বিশ্বাসী ছিলেন না, যেখানে একজন শীর্ষে থাকবে এবং বাকিরা ধাপে ধাপে তার নীচুস্তরে থাকবে। প্যানথেয়িস্টিক মতবাদের মতো, যেখানে সর্বই এক এবং একই সর্ব, গান্ধী তেমনই সম-কেন্দ্রীয় বৃত্তে বিশ্বাস করতেন, যেখানে একটি বৃত্ত অপর বৃত্তগুলিকে সামনে আসতে উৎসাহ দেবে। এই কারণেই তিনি স্বদেশীর নীতি প্রণয়ন করেন (আত্মনির্ভরতা, অথবা নিজের দেশে পণ্য উৎপাদন) এবং খাদি ও কুটির শিল্পকে অসম্ভব গুরুত্ব প্রদান করেন (খাদি হল হাতে বোনা সুতির কাপড় যা তিনি নিজে পরিধান করতেন)। ভারতবর্ষের মতো দেশে এই জাতীয় পরিকল্পনা কার্যকরী হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল, যেখানে অনেক মানুষ বাড়িতে থেকে কাজ করেন এবং এর দ্বারা লিঙ্গসাম্যও বজায় রাখা সম্ভব কারণ মহিলারাও তাঁদের অবসর সময়ে নিজের ঘরে নানা দ্রব্য তৈরি এবং হাতের কাজ করে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

'লোক্ষ্যম্‌গ্রহের' ধারণা (সামাজিক কল্যাণের দ্বারা বিশ্বসংহতি স্থাপন) এবং 'স্থিতপ্রজ্ঞ'—অর্থাৎ যে ব্যক্তি মানসিকভাবে স্থিতিশীল এবং অচঞ্চল—এসবই তাঁর অহিংসার দর্শনের সঙ্গে যুক্ত। এন. ভি. নাদকার্নি যেমন বলেছেন, গান্ধীর দৃষ্টিকোণ থেকে হিন্দুধর্মের অহিংসার ধারণা শুধুমাত্র একটি নঞর্থক ধারণা নয়, অর্থাৎ এটি শুধুমাত্র হিংসা এড়িয়ে চলার কথা বলে না; প্রকৃতপক্ষে এর মাধ্যমে দাবি করা হয় যে, এই মতের পালনকারী সামাজিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত হবেন, তিনি কর্মযজ্ঞে দয়াপ্রবণ ও যত্নশীল হবেন। তাই গান্ধীর দৃষ্টিভঙ্গির একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল নিঃস্বার্থ সামাজিক সেবার ওপর গুরুত্ব আরোপ।

গান্ধীর কাছে সত্য বা ঈশ্বর কোনোটিই কোনো দূরতম পর্বতশৃঙ্গ নয়। তিনি মনে করতেন যে, অপরের দুঃখ দূর করে এবং সেই প্রক্রিয়ার দ্বারা তাদের শক্তিমান করে তোলার মাধ্যমেই সত্য বা ঈশ্বরের খোঁজ করতে হবে।

মহাত্মা গান্ধী, ভারতের গুজরাট রাজ্যের আমেদাবাদ নগরীর সবরমতী থেকে যে মহান অতীন্দ্রিয়বাদী সন্ন্যাসী এসেছিলেন, তিনি হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যে সত্য ও অহিংসার মন্ত্র নিয়ে কোনো সমস্যা সমাধান করতে চেয়ে মানুষের শ্রেষ্ঠ প্রচেষ্টাও অনেকসময় যথেষ্ট হয় না। তাই তিনি বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে ঈশ্বরের সাহায্য নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। এবং এভাবেই তিনি এমন সাফল্য লাভ করলেন, যা এর আগে অসম্ভব বলেই ভাবা হত।

তাঁর অগ্রগতি এবং ক্রিয়াকর্মের বিভিন্ন ধাপে তাঁর অস্তিত্বের আধ্যাত্মিক দিকটি ধীরে ধীরে আরো বেশি জোরদার হয়ে উঠছিল, শেষ পর্যন্ত এটিই তাঁর পরবর্তী সফলতার ক্ষেত্রে সবচেয়ে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে। তাঁর রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে প্রার্থনা ও স্তবস্তুতি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে যায়।

সিদ্ধান্ত

সুতরাং মোটামুটিভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, গান্ধী ভক্তি বা আত্মোৎসর্গ বা আধ্যাত্মিক পথ অবলম্বন করে সূক্ষ্ম সামাজিক সংস্কার সাধনের লক্ষ্যে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার প্রতি মনোনিবেশ করেছিলেন। তাঁর আত্মজীবনীতে "সত্যের সঙ্গে আমার পরীক্ষার কাহিনিগুলি"-র শেষাংশে তিনি বলেছেন, "আমি যেটা অর্জন করতে চাই—বিগত ত্রিশ বছর ধরে যেটা অর্জন করার জন্যে আমি চেষ্টা করে চলেছি এবং যাকে পাখির চোখ মনে করে এগিয়েছি তা হল, আত্মোপলব্ধি, ঈশ্বরকে সামনে থেকে দেখা এবং মোক্ষলাভ করা। এই লক্ষ্যপূরণের খোঁজেই আমি বাঁচি, আমি চলি, আমার অস্তিত্ব ধারণ করি।

আমার কথন ও লেখনের দ্বারা আমি যা কিছু করি এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমার যা যা কর্মকাণ্ড রয়েছে তার সবই এই লক্ষ্যের দিকে ছুটে চলেছে। কিন্তু যেহেতু আমি এটা বরাবরই বিশ্বাস করেছি যে, যেটা একজনের পক্ষে করা সম্ভব, সেটা সবার পক্ষেই করা সম্ভব, তাই আমার এই পরীক্ষানিরীক্ষা বন্ধ দরজার ওপারে সংঘটিত হয়নি, খোলা মঞ্চে হয়েছে এবং আমি মনে করিনা যে এই সত্যটি তাদের আধ্যাত্মিক মূল্যের থেকে বিচ্যুত হয়েছে। এমন কিছু জিনিস অবশ্য আছে যা শুধুমাত্র সৃষ্টি এবং তার স্রষ্টাই জানে। এই বিষয়গুলি অন্যকে বলা যায় না। যে পরীক্ষানিরীক্ষা সম্পর্কে আমি কথা বলছি সেগুলি এই গোত্রের নয়। সেগুলিকে আধ্যাত্মিক অথবা নৈতিক বলা যেতে পারে, কারণ, ধর্মের মূল নির্যাসই হল নৈতিকতা।"

ছোটবেলায় গান্ধীর পরিবারে বিভিন্ন ধর্মের মানুষেরা আসতেন—পার্সী, জৈন, বৌদ্ধ এবং মুসলিম। তাঁর পিতার সঙ্গে রাজনৈতিক আলোচনা করার জন্যই এইসব অতিথিরা আসতেন। তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে কীভাবে তাঁর বাড়িটি ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে কথোপকথনের একটি ক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল। 'ভগবদ্‌গীতা', 'ধর্মতত্ত্বের চাবি' নামের বইটি, 'বাইবেল' (মূলত 'নূতন নিয়ম') এবং স্যার এডুইন আর্নল্ডের লেখা 'এশিয়ার আলো' এই বইগুলি পড়ে তিনি ভিন্ন ভিন্ন বিশ্বাসের মধ্যেকার সংযোগসূত্র সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করতে শুরু করেন। এটাই তাঁকে বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে পরীক্ষানিরীক্ষা করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং এভাবেই

তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছোন যে 'দেবত্ব' সম্পর্কে সব ধর্মের একটি সাধারণ ও সার্বজনীন ধারণা রয়েছে।

ধর্মের দর্শন সম্পর্কে গান্ধীর ধারণার উপরোক্ত আলোচনা থেকে যে বক্তব্যটি উল্লেখযোগ্যভাবে উঠে আসে তা হল, তিনি কখনোই পরম্পরাগত বা প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের দিকে ঝোঁকেননি। যদিও ঈশ্বর, আত্মা, আত্ম, সত্য ইত্যাদি শব্দগুলিকে একে অপরকে বোঝানোর জন্যে ব্যবহার করার কারণে তাঁকে সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, এবং তাই ধর্ম সম্পর্কে তাঁর দার্শনিক সন্দর্ভগুলিতে পরিবেশিত যুক্তিগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে; তবুও যে ধারণায় তিনি অবিচল ছিলেন তা হল নৈতিকতা এবং নীতি হল ধর্মের সহজাত বিষয়। সেই জন্যই তিনি ধর্মকে তার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো দিয়ে বিচার করতে চাননি কারণ প্রতিটি ধর্মের একটি নির্ধারিত আকার আছে, যেটা গান্ধী স্বীকার করতে পারেননি। সুতরাং সত্য এবং নৈতিকতার অপর নামই ধর্ম। সেই কারণেই ঐ সমালোচনাগুলি সঠিক নয়।

ভিখু পারেখের মতে, সাম্প্রতিক কালে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন দেখা দিয়েছে—আন্তঃধর্ম কথোপকথনের প্রয়োজন; অন্তঃধর্ম কথোপকথনের প্রয়োজন; এবং যেসব ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে জটিল সমস্যা রয়েছে, অথবা রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক স্বার্থ জড়িত রয়েছে, তাদের মধ্যে কথোপকথনের প্রয়োজন। এই বিষয়গুলি আলোচিত হওয়া প্রয়োজন। খুব কম লোকই এই বিষয়গুলি নিয়ে উদ্যোগ নেন, কারণ না হলে তারা খুব সমস্যা-সংকুল পরিণতির দিকে চলে যেতে পারে (বা চলে যাচ্ছে)। গান্ধী এমন একজন মানুষ ছিলেন যিনি এই চেষ্টা করেছিলেন, যদিও কিছু ক্ষেত্রে তা নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে, তিনি এই ভীষণ ভঙ্গুর ও সূক্ষ্ম বিষয়গুলিকে যথাযথভাবে তুলে ধরেছিলেন এবং এসব বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেছিলেন। ভিখু পারেখ যেমন লিখেছেন, গান্ধীর কাছে যুক্তি এবং অভিজ্ঞতাই ছিল জ্ঞানের সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য উৎস এবং মানবজীবনের পথনির্দেশক। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র অবশ্য এমনভাবে এদের অধীন নয়; এমন সব অভিজ্ঞতাও আছে যার পুনর্গঠন সম্ভব নয় বা যাদের পরীক্ষা করা সম্ভব নয়। গান্ধীর যুক্তি হল এই যে, এইসব ক্ষেত্রে যুক্তি এবং অভিজ্ঞতার বাইরে গিয়ে বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করা ছাড়া আমাদের আর কিছু করার নেই। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস যেহেতু সব ধরনের দ্বিমুখী বিশ্বাসের পথ খুলে দেয়, সুতরাং এটা অবশ্যই যুক্তিসিদ্ধ হবে, অন্ধ নয়। যদিও এই দুই ধরনের বিশ্বাসই যুক্তি ও অভিজ্ঞতাকে পেরিয়ে যেতে পারে, এর মধ্যে প্রথমটা তাদের বিরুদ্ধাচরণ করে না বা বৈপরীত্য সৃষ্টি করে না, কিন্তু দ্বিতীয়টা সেটা করে। এটি তাদের দ্বারা অনুমতিপ্রাপ্ত এবং স্বীকৃত; যখন তারা নীরব, শুধুমাত্র তখনই তাদেরকে অতিক্রম করে এবং তাদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। গান্ধীর মতে, ঈশ্বর বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এটাই ঘটে।

উপরোক্ত বক্তব্য সোরেন কিয়ের্কেগার্ড-এর "বিশ্বাসের ঝাঁপ" (the leap of faith) তত্ত্বটিকে মনে করায়। গান্ধীর এই অভিগমন, সম্ভাব্য কথোপকথন ও আন্তঃধর্ম সহনশীলতার লক্ষ্যে একটি প্রচেষ্টার জন্ম দেয়। কেউ যখন নিজের বিশ্বাসের একটি দৃষ্টান্ত (paradigm) তুলে ধরে, তখন তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে। কিন্তু ধর্ম থেকে ঈশ্বরে প্যারাডাইমের এই পরিবর্তন সম্ভবত বর্তমান প্রজন্মের অনেকে জটিল সমস্যা সমাধান করতে পারবে। গান্ধীর ধর্মীয় দর্শন সেখানেই এই দৃষ্টান্তকে উপস্থিত করে যেখানে দ্বন্দ্বের অবসান হয়েছে এবং সম্ভাব্য কথোপকথন শুরু হতে পারে। সুতরাং গান্ধীকে একজন 'ধর্ম সংস্কারক'

বলা যেতে পারে। তিনি যুক্তিবিরোধী এবং অনৈতিক বিষয়সমূহ সরিয়ে ধর্মকে বিশুদ্ধ করে তোলার প্রচেষ্টা চালান। তিনি বিশ্বাস করতেন যে ধর্মের মূল লক্ষ্য হল মানুষকে আধ্যাত্মিক পথে এবং নৈতিক জীবনে চালিত করা। সারা পৃথিবীর ধর্মগুলি থেকে সেরাটুকু আহরণ করে এবং নৈতিক শক্তি সংগ্রহ করে এমন একটি ধর্মকে তিনি প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন, যা কঠোর ধ্যানধারণায় ভারাক্রান্ত নয় এবং সবরকম গোঁড়ামি থেকে মুক্ত, পরিস্রুত। এটাই খুব ভালোভাবে সাম্প্রতিক সমস্যাগুলির সমাধান করতে পারবে। গান্ধী বিশ্বাস করতেন যে একই ধর্মকে সহ্য করাটাই যে শুধু গুরুত্বপূর্ণ তা নয়, একই রকম গুরুত্বপূর্ণ হল অন্যান্য ধর্মকে শ্রদ্ধা করা। "ইয়ং ইন্ডিয়া"তে গান্ধী বলছেন, "আমি অনেকদিন আগেই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলাম যে ... সব ধর্মই সত্য এবং সবারই মধ্যে কিছু না কিছু ত্রুটি আছে, এবং আমি যখন আমার ধর্মকে ধরে রাখব, তখন অন্যান্য ধর্মের প্রতি হিন্দুধর্মের মতোই যত্নশীল হব। একজন খৃষ্টান কখনোই হিন্দু হবেন না। কিন্তু আমাদের অন্তরের অন্তঃস্থলে আমরা এই প্রার্থনাই করব যে একজন হিন্দু আরো ভালো হিন্দু হবেন, একজন মুসলিম আরো ভালো মুসলিম এবং একজন খৃষ্টান আরো ভালো খৃষ্টান হবেন।"